প্রিয় অভিভাবক, একটু ভাববেন কি?

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। একজন বয়স্ক লোককে বলতে শুনলাম, ‘সেই দিন কি আর আছে? দুনিয়া বদলে গেছে।’ বললাম, ‘চাচা, সেই দিন দিনই আছে। সেই দুনিয়া দুনিয়াই আছে। শুধু মানুষগুলো বদলে গেছে।’

মুরব্বি চাচা কথাটা বড় আক্ষেপ করেই বললেন। চারিদিকে যেভাবে শুরু হয়েছে কিশোর কিশোরীদের চলা ফেরা তাতে এমন কথা বলা স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। দিন দিন আমাদের কিশোর কিশোরীদের মধ্যে যেভাবে অপসংস্কৃতি ঢুকে যাচ্ছে তাতে ওদের নিয়ে দু’কথা না বলেও উপায় নেই। সংস্কৃতির চর্চা করতে গিয়ে অপসংস্কৃতি ঢুকে পড়ছে। দেখে দেখে শিখবে শিখুক। ভালো কাজ হলে আপত্তি নেই। কিন্তু মন্দটা নিয়ে কথাতো বলতেই হয়।

আমরা সকলেই সৌন্দর্য পছন্দ করি। তাই বলে এমন সৌন্দর্য চাই না, যে সৌন্দর্য আমাকে, আপনাকে বিপথে নিয়ে যাবে। সৌন্দর্য আবার বিপথে নিয়ে যায় কি করে? হ্যাঁ সে কথায় আসছি।

একজন মানুষের স্বভাব, মন-মানসিকতা কেমন হবে তা তার পরিবার, সমাজ, পরিবেশ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাবা-মায়ের শাসন-বারণ অনেকটা এগুলোর উপর নির্ভর করে। আপনার সন্তানকে আপনি যেভাবে গড়ে তুলবেন সে সেভাবেই গড়ে উঠবে। শিশুরাতো নরম তুলতুলে উপকরণ, যে ছাচে ফেলবেন সেটাই তৈরি হবে।

আমরা ছোটবেলায় সন্ধ্যার পর রাস্তায় বের হলে পাড়াতো চাচা, ভাইয়েরা বলতো, ‘ খোকা, সন্ধ্যার সময় বাইরে থাকতে নেই? বাড়ি যাও, পড় গিয়ে।’ তখন আর উপায় থাকতো না। তাদের সাথে তর্কবিতর্ক করার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ আমাদের শাসন করার অধিকার তাদেরকে দেওয়া হত। কিন্ত বর্তমান সময়ে সেই অধিকার খর্ব হয়েছে।

এখন ছেলেমেয়েরা বড়দের সাথে তর্কবিতর্ক করে। জোর করে কিছু বললে বরং অভিভাবকেরাই বলে, ‘আমার ছেলেমেয়েকে শাসন করার তুমি কে হে।’ আমি বলি কি, আমাদের অনেক কিছুই। আপনার অবাধ্য সন্তানের জন্য আমারটা যে নষ্ট হতে চলেছে।

ছেলে-মেয়েদের এই বেখেয়ালিপনা, বখাটে হয়ে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে

বেশি দায়ী অভিভাবকেরা।

রাতের বেলা চায়ের দোকনে সিনেমা দেখতে আসবে পথ দেখার জন্য ছেলেকে টর্চ লাইট কিনে দিতে দেখেছি আমি। এইতো সেদিনের কথা, সেলুনে গিয়ে দেখি আমার এক পরিচিতজন তার ছেলের মাথার চুলের কাটিং দিয়েছে বাটি কাট। আমি বললাম, ‘ছেলের চুল এভাবে কাটালে কেন?’ প্রতিউত্তরে বলল, ‘আশেপাশে এখন এই চলছে।’ আমি বললাম, ‘আশেপাশে কিন্তু এখন এমনও চলছে, বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা, গায়ে হাত পর্যন্ত উঠানো। এসবগুলোর জন্যেও প্রস্তুত হও। তুমিই ওকে সব চলাচলি শেখাচ্ছো।’

আমাকে দিয়েই বলি। যখন সিনেমা দেখতাম তখন কল্পনায় নিজেকে সিনেমার নায়ক মনে করতাম। দেখা গেল সিনেমা চলাকালীন নায়কের মারপিট দেখে আমিও পাশের জনকে হঠাৎ দুম করে বসিয়ে দিয়েছি। অথবা সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছি দুমা দুম দু ঘুষি। নায়কের হাত-কপাল কেটে, ফেটে গেলে নায়িকা শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিতেন।

কিন্তু আমি গো বেচারা প্রতিক্রিয়া পেতাম বকুনি আর হাতের অসহ্য ব্যথা। এরপরও ক্ষান্ত হইনি। নায়কের মত হতেই হবে। এ জন্য দেখাদেখি চুল ছেটেছি, প্যান্ট কিনেছি ছেঁড়া ফাঁটা। এখন আমার মেজাজ মর্জি দেখে কে। আমিও নায়ক। হায় হায়, বাড়িতে এসে দেখি ভাত নাই। বুঝলেন না? যদি বলি হাড়িতে ভাত নেই, সেটাও ঠিক আবার যদি বলি সমাজে আমার কোনো মূল্য নেই সেটাও মন্দ বলা হবে না। কল্পনার নায়কের বাস্তবের এই হাল।

এমন ঘটনাও রহরহ ঘটছে, ভারতের নাটক সিনেমার সিরিয়াল দেখে ওসব চরিত্র নিজের মধ্যে কল্পনায় এঁকে নিজেকে ওমন পোশাকে সাজাতে বাধ্য করেছে পোশাক কিনে দিতে। হয় পোশাক দাও, না হয় বিষ দাও। এজন্যই বলছি, ছেলে-মেয়েরা যে পরিবেশের সাথে পরিচিত হবে সে নিজেকে সেভাবেই প্রস্তুত করতে চাইবে।

এসব ছেলেরাই আজকের গ্যাং কালচার গড়ে তুলছে। টিকটকের অমক ভাই তমক ভাই হয়ে উঠছে। এরা আজ উন্মুক্ত। ইচ্ছে মত চুলের কাটিং দেয়, রঙ করে, বাইক নিয়ে রোড শো করে। অপসংস্কৃতির চর্চা করে। ঘুরে বেড়ায়। নেশা করে।

আপনি হয়ত ভাবছেন, পরের ছেলে, আমার কী। আপনার অনেক কিছুই। আজ অথবা কাল আপনার সন্তান ওদের দেখানো পথেই হাটবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই আজই সতর্ক হোন।

আপনার সন্তানের হাতে এড্রয়েড ফোন তুলে দিচ্ছেন? সে সারাদিন গেমস খেলে সময় পার করছে। লাখ টাকার বাইক কিনে দিচ্ছেন? রাস্তায় নায়কের মত হেলতে দুলতে চলতে চলতে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে।

অনেক অভিভাবককে বলতে শুনেছি, ‘কি করবো বলো, ওদের সাথে পারা যায় না।’ যখন ওদের সাথে পারা যেত ঠিক তখনি আপনি ইচ্ছে করেই ওদের কাছে হেরে গেছেন। তাই এখন আপনি হারতে বাধ্য হচ্ছে।

একটা কবিতার কথা মনে পড়ে গেলে।

‘ ‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?’’

আমরা সকলেই এই কবিতাটা পড়েছি আর না হয় কারো কাছ থেকে শুনেছি নিশ্চয়। কুসুমকুমারী দাসের বিখ্যাত কবিতা ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতার প্রথম দু লাইন এগুলো। কবি বড় আক্ষেপ নিয়ে লিখেছিলেন এই কবিতা। সত্যিই আজ আদর্শ ছেলের বড়ই অভাব। কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবার ছেলে আজ নিতান্তই হাতে গোনা। আমরাও অপেক্ষায় আছি সেই ছেলের, যে ছেলে সিনেমার নায়ক না হয়ে সত্যিকারের নায়ক হবে; সৎ, নীতিবান ও দেশ প্রেমিক হবে।

চাইনে এমন অপসংস্কৃতি। আমরা বাঙালি। ওমন মর্ডান ছেলের চাইতে ঢের ভালো চাষার ছেলে। বাবার দেওয়া লাখ টাকার বাইকে চেপে রোড শো করা ছেলের চাই হাতে মোহন বাঁশি তুলে নেওয়া গরু মহিষের রাখাল ছেলে অতি উত্তম। যে কিনা মাঠ থেকে ফিরেই বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করবে খাবার খেয়েছে কিনা। চাঁদনি রাতে উঠানে বসে তুলবে ঝুমুর গানের সুর।

লেখক: মুহাম্মদ বরকত আলী (শিশুসাহিত্যিক ও গল্পকার)

মেহেরপুরের উন্নয়ন ভাবনা (শেষ

পর্ব)

অনেক বড় এরিয়া একটি থানার মাধ্যমে কাঙ্খিত নিরাপত্তা সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা এক্ষত্রে আরও একটি থানা চালু করা। যা হতে পারে বামন্দী অথবা সুবিধাজনক স্থানে। তেমনি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা দুটি বীজ ফার্ম আমঝুপি ও বারাদিকে আরও আধুনিকায়ন পদক্ষেপ গ্রহন।

মেহেরপুর ও গাংনী পৌরসভার আয়তন বৃদ্ধি করা। গ্রাম থেকে জেলা পর্যায়ে পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তোলা, বহুতল ভবন নির্মাণে আধুনিক বিল্ডিং কোড মেনে চলে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলা আধুনিকভাবে মুজিবনগর মডেল অনুসরণে উপজেলা অবকাঠামো নির্মাণ করা। আলু, পিঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, টমেটো, গাজর, আম, কাঁঠাল, দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়াজাত এবং বৃহৎ আকারে পাট প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র সহ বিদেশে রপ্তানিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

নিরাপদ খাদ্যের গ্রামীণ হাট নির্দিষ্ট স্থানে গড়ে তোলা। কৃষকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা । এছাড়া অবশ্যই মেহেরপুর জেলার বিসিক শিল্প নগরীকে আধুনিক উন্নয়নমুখী বাস্তবায়ন রূপ দেওয়ার নিমিত্তে আয়তন বৃদ্ধি, টেরিফ ফ্রি জোন ঘোষণা করা সহ সহজ শর্তে জমি ও ঋণ কর্মসূচি চালু করা। আন্তর্জাতিক মানের কৃষি শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা।

৭। সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত স¦য়ংসম্পূর্ণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সমন¦য়ে একটি ৫০ মেগোওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সুব্যবস্থা করা। পারিবারিক শেয়ারে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে। জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানি বিদ্যুৎ জ্বালানী সুনিশ্চিত পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ভোক্তা অধিকার সুনিশ্চিত করা। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় মাদক, ভেজাল ঔষধ, সার, বীজ, অস্ত্র, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, বেকারত্ব, স¦ল্পশিক্ষা, বাল্যবিবাহ এবং বিভিন্ন অপরাধ ও অপরাধী চক্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব রুখে দিতে সর্বমহলে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি, নিরাপদ সীমান্ত নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য প্রশস্ত বর্ডার বেল্ট পাকা রাস্তা তৈরি করা খুবই জরুরি। সর্বোস্তরে যোগ্য নেতা নির্বাচনের জন্য প্রক্রিয়া চালু করা। জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে যাত্রীছাওনি ও ওয়াশরুমের ব্যবস্থা।

রাত্রে নিরাপদ আলোয় পথ চলা সুনিশ্চিত করা। জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহকে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। সন্ত্রাস, মাদক, ইভটিচিং, চাঁদাবাজ, অপরাধ প্রতিবাদ প্রতিরোধে পাড়া ভিত্তিক শান্তি প্রিয় নাগরিক কমিটি গঠন।

৮। ছাত্র ও যুব সমাজ একটি জাতির সেরা হাতিয়ার এবং শক্তি। তাদের নৈতিক আদর্শ, দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠা, মেধা ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ফ্রি ও অংশীদার ভিত্তিক মুক্ত চিন্তার কø◌াব, ব্লাড ব্যাংক, হেলপ ক্লাব, বাঙ্গালী সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্লাব প্রতিষ্ঠা কর্মসূচিসহ গণসচেতনতা মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

মেধা ও প্রতিভা মূল্যায়নে সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নাম করণে বৃত্তি ফাউন্ডেশন চালু করা। তিন উপজেলায় পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি করে ইনডোর স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠা করাসহ মেহেরপুর স্টেডিয়ামকে পূর্ণাঙ্গ রুপ দেওয়া। মেহেরপুর পৌর গড় পুকুর কেন্দ্রীক একটি আধুনিক পার্ক গড়ে তোলা যেখানে ওভার ব্রীজ, ওয়াকিং জোন এবং একটি জীমনেশিয়াম থাকবে। বি.কে.এস.পি.তে চৌকষ ছাত্রদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেনিং এর উদ্যোগ গ্রহণ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় মানের করা। স্কুল কলেজ বাস সার্ভিস চালু করা। শিশু শিক্ষায় ভাল অবদান রাখা চলমান কিন্ডার গার্টেন গুলো যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাদের আরও উৎসাহিত করে শিশু শিক্ষার মানকে আরও উন্নত করতে জোর সুপারিশ করা সহ সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান সুনিশ্চিত করা । এছাড়াও কোচিং ও গাইড বাণিজ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। স্কুল ভিত্তিক ইতিহাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস গুলো নতুন মাত্রায় যথাযথ মর্যাদায় পালন। তিন উপজেলায় আধুনিক প্রতিবন্ধী স্কুল প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্নক চেষ্টাসহ তাদের জন্য একটি আর্নিং হাউজ প্রতিষ্ঠা করা।

৯। দ্রুতগতির প্রযুক্তির এই বিশ্বে টেকনিক্যাল মানব সম্পদ উন্নয়নে যুব উন্নয়ন নির্ধারিত ট্রেনিং সেন্টারের বাস্তবায়ন সহ এভাবে বিভিন্ন বিদেশের চাহিদা এমন ট্রেড শিক্ষা ও ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে সরাসরি বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাংক, দ্যা ল ক্লাব, হজ¦ কাফেলা, মাদক, ভেজাল খাদ্য, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে নাগরিক সেবা প্রদান, পার্ট টাইম আড্ডা জব নামে প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে যেখানে ছাত্র সমাজ শিক্ষিত বেকার তাদের সময় ও মেধাকে অপচয় না করে পার্ট টাইম জব করে অর্থ ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তৈরী করা।

১০। সেবা-আয়-স্বনির্ভরতা এই তিন নীতিতে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবার পূর্ণস্বনির্ভর হবেই এই লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারকে একটি বাড়ি একটি প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত করা এবং একজন করে দক্ষ জনশক্তি বিদেশে পাঠানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং সকলেই উন্নয়নে হবে অংশীদার। পরিবেশ রক্ষা এবং সবুজ মেহেরপুর গড়ে তুলতে পাঁচ কোটি পরিকল্পিত বৃক্ষ রোপণ এবং এ থেকে স্থায়ী ফান্ড গঠন। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে, ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে হবে, হাতে সময় খুবই কম। দারিদ্রতা, বৈষম্য ও বিলাসিতা এই তিন অপরাধের জন্ম দেয়। যে কোন ভালকে স¦◌াগতম জানাতে হবে।

গর্বিত ১৭ই এপ্রিল চেতনায় সময়ের প্রয়োজনে আমাদের এই উন্নয়ন ভাবনা। আমাদের রাজটিকা সৌভাগ্যকে সর্বোত্তম ব্যবহার করে যার যার স্থান থেকে উন্নয়ন ইস্যুতে কাজ করতে হবে। ঐতিহাসিক কারণেই মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর জেলার উন্নয়নে প্রতিটি সরকারকেই কাজে লাগাতে হবে। প্রতিটি দুয়ারে দুয়ারে এই আন্দোলন ও অধিকার তুলে ধরি এবং বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

যারা মেহেরপুর উন্নয়নে ব্যক্তিগত, সংগঠন, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে অবদান রেখেছে এবং রেখে চলেছে তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ ও সম্মান জানায়। আমরা চাই ২০৫০ সালকে সামনে রেখে রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত একটি উচ্চমানের মাস্টার প্লানে সকল পরিকল্পনা ও উন্নয়ন গড়ে উঠুক। আমরা স্থায়ী উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং গঠনমূলক সমালোচনায় বিশ্বাসী।

দলমত নির্বিশেষে সকলের সাথে উন্নয়নে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগী হিসাবে পাশে সবায়কে কাজ করতে হবে। যে কোন অন্যায় অবিচারকে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে নির্ভীক কন্ঠস্বর হিসাবে মেহেরপুরবাসীকে কাজ করে যাওয়ার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন ভাবনা

ভৌগলিক দিক থেকে মেহেরপুর জেলা হিসাবে সবচেয়ে ছোট কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে বড় মর্যদায় অলংকৃত এবং অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ জেলা। যতদিন বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতিকে

ঐতিহাসিক মেহেরপুর জেলাকে প্রতি বছর ১৭ই এপ্রিল সর্বোচ্চ সম্মানে স্মরণ করতেই হবে।

এই দিনেই স্বাধীনতার মহানায়ক বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে জাতীয় চার নেতার সাহসী নেতৃত্বে প্রথম সরকার, শপথ ও রাজধানী ঘোষনা করে নতুন বাংলাদেশের শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল আর মেহেরপুর জেলাবাসির কপালে পড়েছিল রাজটিকা।

পৃথিবীর মানচিত্রে ১৭ই এপ্রিলের এই বীরোচিত ইতিহাস চির অম্লান হয়ে থাকবে। যদি আমরা এই রাজটিকা সৌভাগ্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই, এ জন্য আমারাই দায়ী। স্বপ্নের স্বাধীনতা অর্জনের একদিনের নবজাতক শিশু বাংলাদেশ আজ তার বয়স প্রায় অর্ধশত বছর।
অনেক শাসনের হাত বদল হলেও প্রতিহিংসার ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, ভয়াবহ দুর্নীতি, শোষণ, বৈষম্য, স্ব্◌াধীনতা বিরোধী শক্তির উত্থান, জঙ্গিবাদ, মাদক, সন্ত্রাস, বাল্য বিবাহ, মানব পাচার, লোমহর্ষক শিশু ও নারী নির্যাতন, আইন যেন জিম্মি, প্রজা যেন রাজার ভূমিকায়, স্বাধীনতা যেন পরাধীন আর যতটা দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ কথায় সফল করেছি কিন্তু আজও গড়তে পারেনি পুরোপুরি।

কিন্তু কেন? কি জন্য? কাদের কারণে এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি? জনগণ আজ জানতে ও দেখতে চায় এর গভীর অনুসন্ধান, গবেষণা আর কঠোর পদক্ষেপ। বিশ্ব ইতিহাসে বিরল আমাদের অসীম ত্যাগ আর বিসর্জন। অমৃত যে স্বাধীনতা আজ আমরা ভোগ করছি তা মোটেও সহজ ছিলনা, এ ঋণ কখনো শোধীবার নয়।

১৯৮৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর জেলা ঘোষনা হলেও আজো উন্নয়নে অবহেলিত ও উপেক্ষিত ঐতিহাসিক মেহেরপুর জেলা। স্থানীয় যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে বা অবহেলায় যেভাবেই বলিনা কেন এবং সুধী সমাজও এর দায়ভার এড়িয়ে যেতে পারেননা।

সময়ের প্রয়োজনে আপনাদের দুয়ারে-দুয়ারে পৌঁছে দিতে চাই ঐতিহাসিক মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন ইস্যু এবং একটি সুন্দর স¦নির্ভর আধুনিক মেহেরপুর গড়ার আহবান। ঐতিহাসিক ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার রাজটিকা, আমরা মেহেরপুরকে রাজকীয় ভাবে সাজাতে চাই, এটাই হোক আমাদের স্বপ্ন, প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিশ্রুতি।

শুরু একজন করলেও শেষ সকলে মিলেই করতে হবে। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন দিনের নতুন আশায় থেমে থাকা অন্ধকার থেকে শুরু হবে

আলোর পথে চলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ ধন্যবাদ বেশ কিছু উন্নয়ন ইতোমধ্যে সমাপ্ত করেছেন, কিছু চলমান রয়েছে এবং কিছু উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করায়।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী এবং বাস্তবায়নকারী জেলা হিসাবে মেহেরপুরের উন্নয়নের জন্য কিছু কাজের সুপারিশ রেখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। পীর আউলিয়া ফকির দরবেশ, লালন, বাউল পূণ্য স্থান, আদর্শ কৃষি উর্বর জমিন, ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনে জলন্ত স্মৃতি আর বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে ১৯৭১ সালে ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন, শপথ ও রাজধানী ঘোষনা করা এবং একটি স্বাধীন দেশের শুভ জন্ম ।

আগামী ২০৫০ সালকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলার তিন উপজেলার (মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর এবং ১৮ ইউনিয়ন, ২ পৌরসভা) এর জনসংখ্যা, আবাদি জমি, আবাসন, কৃষি, খাদ্য, জ্বালানী, পানি, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, যোগাযোগ, পরিবহণ, অবকাঠামো, কর্মসংস্থান, অর্থনীতি, ব্যয়ভার, স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ এবং স্বনির্ভরতা অর্জনে সার্বিক দিক গভীর গবেষণা ও গঠনমূলক আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে একটি দীর্ঘ মেয়াদি মাস্টার প্লান দ্রুত তৈরি করা।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর এবং আমঝুপি ও ভাটপাড়া নীলকুঠিকে সর্বাধুনিক ইকো পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা। মুজিবনগর কেন্দ্রিক ১০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হোটেল, সরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বহুতল মোটেল বা রেস্টহাউজ করা।

একটি আধুনিক শুটিং স্পট, মিনি ডিজিটাল সিনেমা হল, শিশু পার্ক সহ মুজিবনগর টু আমঝুপি নীলকুঠি ট্রাম ট্যুরিজম ও নৌ স্পীডবোট ট্যুরিজম যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা। সাংবিধানিক ভাবে ১৭ এপ্রিল প্রথম সরকার দিবস, জাতীয় শপথ দিবস ও রাজধানী ঘোষনা এবং নিয়মমাফিক সবসময় জাতীয় পতাকা উত্তোলন চায়।

ঐতিহাসিক ১৭ই এপ্রিল যথাযোগ্য মর্যাদায় রাষ্ট্রিয়ভাবে উদযাপন চাই। এই দিবসটি পালনে জাতীয়ভাবে সকল স্তরে উদযাপন চালু চাই। ১৭ই এপ্রিল সাত দিন ব্যাপি মুজিবনগরে পর্যটন কেন্দ্র ঘিরে বিশেষ আয়োজনের ব্যবস্থা করা। পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি, বসার স্থান ও ওয়াশরুম ব্যবস্থা রাখা।

ঐতিহাসিক স্থানটি পুরোপুরি গণপূর্ত অথবা জেলাপরিষদ অথবা জেলা প্রসাশন অধীনে একক তদারকি ও সংস্কারভার অর্পণ করা প্রয়োজন এবং বিশেষ বরাদ্দ রাখা ব্যবস্থা করা। মুজিবনগর পিকনিক স্পটটি আরও আধুনিকায়ন করে গড়ে তোলা। ঐতিহাসিক মুজিবনগর আম বাগানটি সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন। মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্রিক বেসরকারী ভাল উদ্যোক্তাদের বিশেষ পৃষ্টপোষকতা পায় সে ব্যপারে পথ তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া।

আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে মুজিবনগর পৌরসভা চালু করা। প্রথম সরকার ও রাজধানী হিসাবে একটি মিনি পার্লামেন্ট ভবন স্থাপন এবং প্রতি বছর অন্তত একটি অধিবেশনের ব্যবস্থা করা। যা স্বনির্ভর ও আধুনিকতা অর্জনে নতুন পথ দেখাবে। মুজিবনগরকে আন্তর্জাতিক মানের ইকো পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে আরো আয়োতন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে মুজিবনগর সংলগ্ন চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা থানার নাটুদাহ ইউনিয়নকে সংযুক্ত করা। মেহেরপুর জেলা মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহি অবহেলিত স্থান গুলোকে চিহ্নিত করন, সংরক্ষণ এবং পর্যটন কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত করা। ঐতিহাসিক মার্চ বাঙ্গালীর জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় (৭ই মাচ, ১৭ই মার্চ, ২৬ শে মার্চ) তাই মাস ব্যাপি পালনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। জেলা উন্নয়নে চায় জেলা ঐক্য, এছাড়া একটি জেলার সার্বিক উন্ন্য়ন সম্ভব নয়। ধর্ম দল যার যার মেহেরপুর হবে সবার।

২। এই উপমহাদেশের সব চেয়ে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী দেশ বৃহত্তর ভারত। ভারত বাংলাদেশের সাথে স্থল বন্দরে যে ব্যবসা বাণিজ্য হয় তার মধ্যে অন্যতম সেরা ব্যবসা পয়েন্ট মেহেরপুর। সেই দিক বিবেচনা করে এই মেহেরপুর জেলায় রেল ও আধুনিক যোগাযোগ সহ সর্বাধুনিক একটি স্থল বন্দর চালু করা। যা মেহেরপুরসহ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমৃদ্ধি অর্জনকে এগিয়ে নিতে ব্যপকভাবে সাহায্য করবে। যা টাকার অংকে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে মেহেরপুরের সন্তান এ এস এম ইমন মেহেরপুরে স্থলবন্দর চাই আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যে আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে সকলেই একাত্মতা প্রকাশ করেছে। (চলবে)

করোনা ও তারুণ্যের অর্থনীতি ভাবনা

দৃশ্য-০১: বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাখ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। তাদের একটা অংশ প্রতিবছরের শেষে কিংবা শুরুতে পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। যদিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার জন্যে দীর্ঘায়িত হচ্ছে সে প্রক্রিয়া। করোনা পরিস্থিতি ভাল হলেই তাৎক্ষণিকভাবেই তারা একাডেমিক যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবে।

দৃশ্য-০২: আমাদের দেশীয় আয়ের বড় একটা অংশ আসে রেমিট্যান্স থেকে। যার সিংহভাগই মিডেল ইস্টে। কিন্তু মিডেল ইস্টের অধিকাংশ দেশই তেলের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বিশ্ববাজারে তেলের দাম আশংকাজনক হারে কমে যাওয়ায় মন্দার কবলে পরতে যাচ্ছে সে সব দেশ। যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার একটা বড় সম্ভবনা রয়েছে। তার ফলাফল ইতোমধ্যেই আমরা দেখতে পারছি। অনেক দেশ থেকেই কর্মীরা ফেরত আসছে, এবং তাদের আবার কর্মস্থলে ফিরে যাবার সম্ভাবনা বা সুযোগ কম।

দৃশ্য-০৩: আইএলও বলছে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪০ ভাগ চাকরি কমেছে। কমবে আরো বেশি।

দৃশ্য-০৪: বর্তমানে দেশে সরকারি চাকরিজীবীরা বাদে বাকিদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। বেতন কমছে,কিংবা বকেয়া জমছে কিংবা ছাটাই হচ্ছে বা হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য মতে দেশে অনেক তরুন অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় দৃশ্য মতে, দেশে ফেরত আসা অনেক মানুষ বেকার হয়ে চাকরির বা ব্যবসার সন্ধান করবে। তৃতীয় দৃশ্য মতে দেশে চাকরী কমে যাবে। প্রথম তিনটা দৃশ্য যদি আমরা এক সুতায় আনতে চাই, আমরা দেখবো দেশে খুব সহসাই ‘বর্তমান কর্মক্ষম’ মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে কিন্তু সহসাই চাকরি বাড়বে না। তাই অনেক বড় একটা অংশ ব্যবসা করতে আগ্রহী হবে।

ব্যবসায় আগ্রহী হওয়া বড় সংখ্যার মানুষের মূলধন এবং দক্ষতার ঘাটতি

দেখা দিবে। আমরা যদি মূলধন নিয়েই কথা বলি, এই করোনায় পারিবারিক আয় ও সঞ্চয় কমছে। তাই আশংকা করা যায়, ব্যবসার জন্য তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাবেই মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে ব্যাংক বড় একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেক বছর ধরেই আমাদের ব্যাংক সেক্টরের অবস্থা ভাল নেই। প্রতিনিয়ত বাড়ছে খেলাপী ঋণের পরিমাণ, অর্থ পাচার তো আছেই। এর পাশাপাশি সরকার বড় একটা পরিমাণ ব্যাংক ঋণ নিয়ে থাকে। ব্যাংক যদি লোনে সুদের হার বাড়ায় সেক্ষেত্রে নতুন বা ছোট পরিসরে থাকা ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ বর্তমানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। ব্যবসায় রাতারাতি লাভ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া বড় একটা সংখ্যা ব্যবসা শুরু করতে না পেরে বা চাকরি না পেয়ে বা দক্ষতা অর্জন করতে না পেরে যদি অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে সমাজে ক্রাইমের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অতীত মহামারীর পরে সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়ার ইতিহাস রয়েছে।

আর সমাজে যদি বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, তাহলে ব্যবসা অনুকূলতা না পেয়ে অনেকেই ব্যবসায় আগ্রহ হারাবে, বাড়বে না বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। বাজারকে বিশ্বাস করতে না পারলে বিনিয়োগ কমে যায়।

এর মাঝেই দৃশ্যমান হবে চতুর্থ দৃশ্য! বড় একটা অংশ তখন কষ্ট করে হলেও সরকারি চাকরির পেছনে ছুটবে। ৩০ বছর পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকবে, কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবে না, এটাও দেশের জন্যে একটা অর্থনৈতিক ক্ষতি।

সম্ভাব্য ফলাফল গুলো ভয়াবহ। আমাদের এখনি সচেতন হতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দক্ষ জনশক্তি, বাজারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে যাতে বিনিয়োগ বাড়ে। তরুণদের হাতেই গড়ে উঠতে পারে আগামীর সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। আবার হতে পারে উল্টোটাও! ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এখনি আমরা কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তার উপর।

লেখক: ডেভলপমেন্ট এক্টিভিস্ট, ই-মেইল:rafiuahamed1971@gmail.com

প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতির যোগসূত্র সঠিক হলেই সফলতা আসবে

“স্বপ্ন পূরণের জন্য তোমার সবগুলো সিঁড়ি দেখতে পাওয়ার দরকার নেই, শুধু প্রথম সিঁড়িটা দেখতে পেলেই হবে”-মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র

প্রতিটি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে কার্যকর এবং সম্ভাবনাময় একটা সিঁড়ি দরকার। যা দ্বারা প্রকৃত পক্ষেই জীবনকে পরিবর্তন করা সম্ভব।সমাজে আজ পর্যন্ত যারা ‘মানুষের মতো মানুষ’ হয়ে উঠেছেন, যত বেশি আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং নিজেকে সৎ, দক্ষ ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গঠন করেছে তাদের নেপথ্যে ‘স্বপ্ন’ পূরণের নেশা কাজ করেছে।সমাজে ‘মানুষের মতো মানুষ’ এবং ‘আলোকিত মানুষ’ হয়ে উঠতে হলে দৃঢ় প্রত্যাশার বিকল্প নেই।

প্রত্যাশা শব্দটি শুনলেই আশা শব্দটির কথা মনে আসে। আশা ও প্রত্যাশা শব্দ দুটি আপাতদৃষ্টিতে সাদৃশ্য মনে হলেও শব্দ দুটির মাঝে রয়েছে বেশ পার্থক্য। সাধারণত একটা মানুষের আশা ভাঙা হয়, কখনো প্রত্যাশা ভাঙা হয়না। এতে মানুষ আশাহত হয়, প্রত্যাশাহত হয় না। অনেক সময় আমরা কোন কথার জোর বাড়াতেও প্রত্যাশা শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। প্রত্যাশা হলো এমন একটি আশা যার সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রত্যয়। অর্থাৎ প্রত্যয় + আশা। আর এটি এমন একটি রূপরেখা বা আগামীর নীলনক্সা যা অর্জন করা সম্ভব এবং অর্জন করা প্রয়োজন। কারণ প্রত্যাশাই জীবনের সকল অর্জনের কেন্দ্রবিন্দু। সেটা ভালো- মন্দ মিলিয়ে। আশা এমনই একটি শক্তি যা দুর্বলকে সাহস যোগায়। শত প্রতিকূলতার মাঝেও আশা মানুষকে সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখায়। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত বড় বড় বিজয় অর্জন হয়েছে, যত দুর্বল অত্যাচারীকে পরাজিত করেছেন, যত মানুষ শূণ্য হাতে শুরু করে বিশাল কিছু হয়েছেন এই সবকিছুর পেছনেই প্রত্যাশা একটি বিরাট ভূমিকা রেখেছে।
যেমন-আমাদের ভাষা শহীদদের প্রেরণার উৎস ছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রত্যাশা। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা। কিংবা আব্রাহাম লিংকন /বারাক ওবামার প্রেসিডেন্ট হবার প্রত্যাশা। সুতরাং প্রত্যেকেরই প্রয়োজন দৃঢ়

প্রত্যাশাশক্তি। এই শক্তিতেই এক জ্যাক মা হতদরিদ্র অবস্থা থেকে কোটিপতি হয়ে যান, এই প্রত্যাশাই টমাস আলভা এডিসনের মত ‘মেধাহীন শিশু’কে জগতের সেরা জিনিয়াস বানায়। ধীরুভাই আম্বানী হয়ে ওঠেন এশিয়ার সেরা ধনী। আমার জীবনকে পরিচালিতকরার জন্য আজও কয়েকটি উক্তি বারে বারে নাড়া দেয়। যেমন-

“যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ আশা আছে-আর ওই জীবনে প্রাণসঞ্চার করবে যখন প্রত্যাশা তৈরী করবে’’।- আমজাদ হোসেন রাজীব
“দেখবার জন্য আমাদের চোখের যেমন আলোর প্রয়োজন, ঠিক তেমনী কোনো প্রত্যয় অর্জন করবার জন্য আমাদের ভাবনার প্রয়োজন”- নিকোলাস খালব্রাঁশ বলেন।
“পৃথিবীতে এমন কোনও হতাশা আসেনি যা প্রত্যাশা কে পরাজিত করতে পারে”- স্যার বার্ণার্ড উইলিয়ামস।
আপনার প্রত্যাশা কখনই পরাজিত হবে না যদি আপনি প্রত্যাশা বা লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত কাজটির সাথে লেগে থাকেন। বাধা আসলেও তা অতিক্রম করার প্রবল ইচ্ছা শক্তি ধারণ করে থাকেন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য শেষ পর্যন্ত অনমনীয়ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান । কারণ প্রত্যাশার আলোকে আপনার জীবন পরিচালিত হলে, সফল হবেন আপনি, আলোকিত হবেন আপনি এবং আপনি আলোকিত হলে আপনার গ্রাম, আপনার জেলা, পুরো দেশ এমনকি গোটা পৃথিবী উপকৃত হবে।
একটি চমৎকার উক্তি আছে, ‘একটি আলোর কণা পেলে লক্ষ প্রদীপ জ¦লে, একটি মানুষ মানুষ হলে বিশ^ জগৎ টলে’। অর্থাৎ আপনি সফল হলে, আপনি আলোকিত হলে আপনার প্রভাবে অন্যরাও আলোকিত হবে। আপনি সৎ হলে, সাহসী হলে অন্যরাও আপনার দেখাদেখি সৎ ও সাহসী হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা পাবে। আপনার এলাকায় এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এভাবে সারাদেশ এমনকি সারা পৃথিবীতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। নিজের এমন ইতিবাচক প্রভাবের ছাপ পৃথিবীর বুকে কে না রাখতে চায়। কিন্তু সবাই কি এরকম সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে? উত্তর যদি না হয়, তবে কেন পারে না?
যারা পারে না, তার কারণ, তারা বড়জোড় চেষ্টা করেন। চেষ্টা হলো, লক্ষ্য অর্জনে বাধাগ্রস্থ হলে যারা আর অগ্রসর হয় না। অগ্রসর হবার আগ্রহ থাকে না। নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যেমন-চেষ্টা করে চৌদ্দতলায় ওঠা যেতে পারে। খুব চেষ্টা করে হয়তোবা পাহাড়ের উঠতে পারবেন। কিন্তু কোনভাবেই এভারেস্টে উঠতে পারবেন না। আপনি চৌদ্দতলায় ভবন কিংবা পাহাড়ের উপর উঠে এই পৃথিবীটাকে যতোটুকু দেখতে পাবেন, আর যদি এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন, তাহলে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি পৃথিবীটাকে দেখতে পাবেন। আপনি কোনটি চান? সিদ্ধান্ত কিন্তু আপনার। মনে রাখা

জরুরী চেষ্টা দিয়ে এভারেস্টে জয় করা সম্ভব নয়। এভারেস্টে জয় করতে হলে চেষ্টার চেয়েও বেশি কিছু দরকার। এই বেশি কিছুটাই হলো প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি হলো বারুদের মতো যাকে একটি বার প্রজ¦লিত করলেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রত্যাশা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন নিজেদের কাছে। তাদের শক্তিশালি প্রতিশ্রুতিতেই নির্মিত আজকের বাংলাদেশ। দেখবেন সমাজে বেশিরভাগ মানুষ, যারা সফল হয়েছেন তারা শুধু চেষ্টাই করে না বরং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কাজ করেন। সুতরাং সফল হতে গেলে এবং ব্যক্তিগত ও সমন্বিত প্রত্যাশা অর্জনে আপনাকে অবশ্যই নিজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। এই প্রতিশ্রুতি আপনার কাছে আপনি করবেন। মনে রাখবেন অনেক বড় প্রত্যাশা থাকার পরেও বেশিরভাগ মানুষ সফল হতে পারে না। তার বড় কারণ তাদের প্রতিশ্রুতির দূর্বলতা।

প্রতিশ্রুতি তখনই দূর্বল হয় যখন মনের মধ্যে কিছু চিন্তা, প্রতিশ্রুতির প্রতি অনিহা বা সফলতার মুখ না দেখা প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। যেমন-আমার দ্বারা কিছুই হবে না! আমি আগে তো পারিনি, এখন কি পারবো! ও আমার থেকে গুণী, যোগ্য, মেধাবী! আজ থাক পরে করবো! আমার অর্থ নেই!
এমন আরও অপ্রাপ্য প্রশ্ন আমাদের গন্তব্যের সোজা পথ থেকে দিশেহারা করে অন্ধকারে চিরতরে ডুবিয়ে দেয়। নিজের ভালো নিজেকেই বুঝতে হবে। কারণ বর্তমান তরুণ সমাজ পথভ্রষ্ট হলে বাংলাদেশকে নিয়ে সকলের দেখা স্বপ্নও মুখ থুবরে লুটিয়ে যাবে মাটিতে।

সুতরাং সময় কম, সুস্থ্য সমাজ গঠন করতে ও মেধাবী এবং কর্মঠ তারুণ্যের উদ্দীপ্ত শক্তি পেতে যুবকদের মধ্যে স্বপ্নের বীজ বপনের বিকল্প নেই। বিপথে ঝোঁকা থেকে রুঁখতেপ্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।###

লেখক-উন্নয়ন কর্মী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার

জগৎ সংসারের শত দুঃখ আর কষ্টের মাঝে যার একটু সান্ত্বনা আর অনুপ্রেরণা আমাদের সমস্ত বেদনা দূর করে দেয়, দুঃখে-কষ্টে, সংকটে-উত্থানে যিনি মাথার উপর ছাঁয়া হয়ে দাড়াঁন তিনিই হলেন পিতা।

হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই এরশাদ করতে শুনেছি, পিতা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য হতে উত্তম দরজা। অতএব তোমার ইচ্ছা, এই দরজাকে ধ্বংস করে দিতে পার। অথবা এই দরজাকে রক্ষা করতে পার। (তিরমিযী)

ইসলামে পিতার আনুগত্য ও মর্যদার প্রতি খেয়াল রেখে সদ্ব্যবহার ও আদব রক্ষা করে চলা সন্তানের উপর অপরিহার্য।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লামের অবস্থা দেখুন! তিনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধায় দেখতেন যে, নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোকে আমার পিতা নিজের হাতে তৈরী করেন। এবং তার যেমন ইচ্ছা হয় নাক, কান, চোখ এবং দেহাবয়ব কাটেন, ফুটা করেন এবং জোড়া লাগান। তারপর ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন। তাহলে, এগুলো কি খোদা হতে পারে? কিম্বা খোদার সমতুল্য ও সমকক্ষ বলা যেতে পারে? কখনও না, এরপর নবুওত লাভ করে সর্বপ্রথম তিনি এদিকেই মনোযোগ দিলেন।

আর মূর্তি পুজার বিপক্ষে যখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লামের সথে তাঁর পিতার বির্তক হয়ে গেল তখন তাঁর পিতা তাকে বললেন, কুরআনের ভাষা: ‘ইব্রাহীম! তুমি কি আমার খোদাদের প্রতি অসন্তুষ্ট? তুমি যদি এমন কাজ থেকে নিবৃত্ত না হও, তবে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিব। যাও, আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও।’(সুরা মরইয়াম; ৪৬)

এমন কঠোর ও মনোবেদনাদায়ক কথোপকথনের সময়ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসাল্লাম পিতার সম্পর্কের মর্যদা রক্ষা করে বলেছেন যে, কুরআনের ভাষা: ‘আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। অচিরেই আপনার জন্য আমি আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিঃসন্দেহ, তিনি আমার প্রতি সতিশয় দয়াবান।’(সুরা মরইয়াম; ৪৭)

দেখুন মহান আল্লাহ তা’য়ালা পিতার প্রতি এতটায় এহছান করেছেন যে, পিতা সন্তানদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করতে বলার পরও তার সাথে

ইহসানের আচরণ করতে বলেছেন।

একবার রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আসল তার সাথে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক, তোমার সাথে এই বৃদ্ধ লোকটি কে? সে বললো, ইনি আমার পিতা। তিনি বললেন, তার সম্মুখে হেঁটো না, তার পূর্বে বসো না, তার নাম ধরে ডেকো না, এবং তাকে গালি দেওয়ার কারণ হয়ো না।(অর্থাৎ তুমি কারো পিতাকে গালি দাও, আর সে জবাবে তোমার পিতাকে গালি দেয়) (হায়াতুস সাহাবাহ)

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন দেখতে পেলেন, দু’জন লোক রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন অন্যজন থেকে অধিকতর বয়ষ্ক। কনিষ্ঠজনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘সংগের লোকটি তোমার কে? সে বলল ‘আব্বা।’ তিনি বললেন, ‘তুমি কখনও তার নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর আগে আগে চলবে বা এবং তাঁর বসার আগে কোথাও বসবে না।’

ইবনে মুহাইরিয রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, পিতার পথ থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্ত্ত সরানোর উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর আগে চলা তার অবাধ্যতার নামান্তর।

ওমর ইবন যরকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আপনার প্রতি আপনার ছেলের আনুগত্য বা সদ্ব্যবহারের অবস্থাটা কেমন ছিল? তখন তিনি বললেন, আমি দিনের বেলায় হাঁটলে সে আমার পিছনে পিছনে হাঁটত; আর রাতের বেলায় হাঁটলে সে আমার সামনে সামনে হাঁটত; আর আমি নিচে থাকলে সে কখনও ছাদের উপরে উঠত না।’(উয়ুনুল আখবার)

পিতার অবাধ্য হলে দুনিয়াতেই তার শাস্থি পাওয়া যায়।

আর আসমা’য়ী বলেন, আরবের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ ও সবচেয়ে অনুগত মানুষের সন্ধানে বের হলাম; অতঃপর আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত আমি দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম, পানি উঠানোর জন্য যার গলায় রশি দিয়ে বালতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যা টেনে উঠানো উটের পক্ষেও সম্ভব নয়, আর তার পিছনে চামড়ার পেঁচানো রশি (চাবুক) হাতে এক যুবক তাকে প্রহার করছে; আর সে এ রশি দ্বারা পিটিয়ে তার পিঠ রক্তাক্ত করে ফেলেছে। অতঃপর আমি বললাম, তুমি কি এই দুর্বল বৃদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহকে

ভয় করনা? তার ঘাড়ে রশি লাগিয়ে দেওয়াটা কি যথেষ্ট হয়নি যে, তুমি তাকে আবার প্রহার করছ?

তখন সে বলে, তাতো আমি আমার পিতার সাথে এই ব্যবহার করছি(তাতে তোমার কি); তখন আমি বললাম: তাহলে তো আল্লাহ তোমাকে ভালো পুরস্কার দিবেন না।

তখন সে বলল, চুপ কর, সে তো তার পিতার সাথে এরূপ ব্যবহার করত; আর তার পিতাও তার দাদার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত; তখন আমি বললাম: এই হলো সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ।

অতঃপর আমি ঘুরতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত দেখা পেলাম এক যুবকের, যার ঘাড়ে একটি ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে এক বৃদ্ধলোক, মনে হচ্ছিল যেন একটি মুরগীর বাচ্চা; তারপর সে সব সময় তাকে তার সামনে রাখত এবং তাকে খাওয়াতো যেমনিভাবে মুরগীর বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়; তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম: উনি কে? সে বলল: আমার আব্বা, বয়সের ভারে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আমি তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছি; তখন আমি বললাম, এই হলো আরবের সবচেয়ে অনুগত ও ভাল মানুষ।(ইবরাহীম আল-বায়হা ‘আল-মাহাসেন ওয়াল মাসাওয়ী)

ছাবিত বুনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, কোনো এক স্থানে সে তার পিতাকে প্রহার করছে। তখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ব্যাপার কী? এখানে এনে তোমার পুত্র তোমাকে প্রহার করছে কেন? পিতা বলল তাকে ছেড়ে দাও। কারন আমি আমার পিতাকে এই স্থানে প্রহার করেছিলাম। সুতরাং তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ আমার ছেলেও আমাকে ঠিক ঐ স্থানে মারছে। তার কোনো দোষ নেই।(তাম্বীহুল গাফেলীন)

আল্লাহ তা’য়ালা আমাদেরকে পিতার হক আদায়ের দ্বারা মহান আল্লাহ্ তা’য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন।(আমীন)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

লেখক:
বায়োকেমিস্ট, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা

ঈদের করোনাকাল ও সেকাল

’ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ’…….গানটি এই প্রথমবারের মতোন আমাদের মধ্যে মন খারাপের আবেশ তৈরী করছে। যাপিত জীবনে এরচেয়ে নিরানন্দের ঈদ আমাদের জীবনে আসেনি। এবারের এই পার্থক্য তৈরী করে দিয়েছে করোনা। এই মহামারি আমাদের সকল আনন্দ মাটি করে দিয়েছে। অথচ ঈদের রঙ এমন ছিলোনা।

ঈদ মানে, খুশী ঈদ মানে আনন্দ। এই উৎসব এখন শুধু মুসলমান ধর্মের অনুসারীদের নয় এখন এই উৎসব সার্বজনীন। হাজার হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এই উৎসব সাম্যের বারতা নিয়ে আসছে। এই আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বস্তরে। ধনী-গরিব-যুবক-বৃদ্ধ, নারী-শিশু, কিশোর-কিশোরী সবাই অদৃশ্য এক অনুভূতিতে আলোড়িত হন। এ অনুভূতির রূপভেদ থাকতে পারে। মাত্রাগত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু ঈদ সন্দেহাতীতভাবে সবাইকে ছুঁয়ে যায়।

দুই ঈদের মধ্যে ঈদুল ফিতরেই ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে বেশি। দীর্ঘ একটি মাস রোজা রাখার পর পশ্চিম আকাশে এক ফালি চাঁদ ওঠে। চাঁদ দেখেই মনের গহীনে রিন্ রিন্ করে বেজে ওঠে ঈদের খুশির ঘণ্টাধ্বনি। ঈদের মূল আনন্দ ও চেতনা সকল কালে এক ও অভিন্ন কিন্তু এবারে পার্থক্য তৈরী করে দিয়েছে করোনা। করোনাকালের আগে শাওয়ালের চাঁদ দেখা হলেই পরদিন ভোরে উঠেই শুরু হয়ে যেতো ঈদের উৎসব । সকাল সকাল গোসল সেরে নতুন কাপড় পরে বাড়ীর সকলের সাথে দলবেধে ঈদগাহে যাওয়া; দু’রাকাত নামাজ পড়া এবং খুৎবা শোনা; গরিব মিসকিনদের দান খয়রাত করা, আত্নীয় স্বজনের বাড়ীতে বেড়ানো, নিজের বাড়ীতে সকলকে আপ্যায়ন, দলবেধে ঘোরা, আড্ডা দেয়ার মধ্য দিয়েই কেটে যেতো ঈদের দিন।

করোনাকালের আগের ঈদের সবচেয়ে বড় দিক ছিল অকৃত্রিম আন্তরিকতা।সেই ঈদে নিভাজ নিপাট আনন্দ নিয়ে প্রাণ খুলে একে অন্যের সঙ্গে মিশেছে মানুষ। কিন্তু করোনা এসে সব শেষ করে দিয়েছে। আমাদের সকল সামাজিক, পারিবারিক বাঁধন একবোরে শিথিল, ঢিলে করে দিয়েছে। আমরা আজ সবছাড়া, বিচ্ছিন্ন, তাই এবারের ঈদ আমাদের জন্য বড্ড বিষাদের, বড্ড কষ্টের। গত ঈদেও বাড়ীর ছোটরা ছিলো সবচে বেশি উচ্ছ্বল। নতুন জামাকাপড়, সালামি, ঘোরার আনন্দে সারা বাড়ী চনমনিয়ে রাখতো। এই আনন্দ শুধু ছোটরাই করতো- তা না আমরাও আমাদের ছোটবেলায় এটা করতাম। তবে আমাদের সময়ে আজকের মতো এতো রেডিমেড গার্মেন্টস ছিল

না। অধিকাংশ সময়ে বাজার থেকে কাপড় কেনা হতো তারপর দর্জির দোকানে মাপজোখ দিয়ে কী দারুণ অপেক্ষা!

আর মনে মনে প্রার্থনা-আমার কাপড় যেন সবচেয়ে সুন্দর হয়। মনে মনে শঙ্কা-যদি যথাসময়ে সেলাই শেষ না হয়। মাঝে মাঝে কাপড়ের দোকানে তাগাদা দেবার জন্য মাকে জ্বালাতাম। এই মহামারির আগে প্রত্যেক ঈদ শুরু হতো সেই ভোর বেলায়। ভোরে উঠেই হইহুল্লুড়। গোসল সেরে সাজবার পালা। নতুন কাপড়, মাথায় টুপি, চোখে সুরমা আর গায়ে সুগন্ধী আতর। তারপর দল বেঁধে ঈদগায় যাত্রা। নামাজ শেষে কবর জিয়ারত, পাড়া মহল্লার সবার সাথে কোলাকুলি করে বাসায় ফিরে আসা। ফিরে এসে বড়দের পায়ে ধরে সালাম, ছোটদের সালাম নেয়া আর সালামি দেওয়ার রেওয়াজ বরাবরের মতো। সব ঘরেই রকমারি খাবার তৈরি। চারদিকে খাবারের মিষ্টি সুবাস, হাসিখুশি আর আনন্দ। আমাদের নামাজ পড়ে আসার আগেই পরিবারের নারী সদস্যরা গোছল করে নতুন কাপড় পরে বসে থাকতো। আমরা ফিরে আসার পরে সবাই একসাথে খেতে বসতাম। মিষ্টি, দই, লাচ্ছা সেমাই, খিচুড়ী, মুরগী, গরুর গোস্ত আর পোলাও-ছিলো ঈদের খাবার। করোনাকালের আগে দেখতাম মা, আমার স্ত্রী, বোনেরা বাসার আসে পাশের ঘরে খাবার পৌঁছিয়ে দিতো।

এবারের ঈদে এসবের কিছুই হবেনা। প্রতিবার সবচে উপভোগ করতাম ঢাকা থেকে বাড়ী যাওয়া। ঈদের সময় রাস্তায়, ট্রেনে ও বাসে দেখা যেতো প্রচন্ড ভিড়। সবাই নাড়ীর টানে বাড়ী যেতে চাই। কেউ বাড়ীতে, কেউ শ্বশুরবাড়ি কেউ কেউ আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। ফেরিঘাটের অসহনীয় জাম শেষে নদীটা পার হলেই সব কষ্ট শেষ। এবারে একদম বন্দী জীবন। যারা বের হচ্ছেন সেই রাস্তায় বের হওয়া মানুষগুলো ভয়ে, শংকায় আতংকিত। সবাইকে একটা অদৃশ্য ভয় তাড়া করে ফিরছে। আমরাও একটা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছি। ঈদের কোন কিছুই আমাদের স্পর্শ করছেনা। ছোটবোনটা তার বাচ্চাদের নিয়ে তার শহরে একা, বাচ্চাদের বাবা তার কর্মস্থলে, মা বাড়ীতে একদম ছোটবোনটাকে নিয়ে মন খারাপ করে আছে আর আমরা চারজন ঢাকাতে। এবারে ছোটভায়ের নতুন বউকে নিয়ে প্রথম ঈদ করার কথা ছিলো আমাদের। করোনা সেটা করতে দিলোনা।

এবারের ঈদ আমাদের যাপিত জীবনে স্মরনীয় হয়ে থাকবে। এই প্রথম সকালে হুল্লোড় করে ঘুম থেকে উঠা হবেনা, দলবেধে ঈদগাহে যাওয়া হবেনা, জামাতে নামাজ পড়া হবেনা, নামাজ শেষে কোলাকুলি হবেনা, বাড়ীতে বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া হবেনা, হবেনা আনন্দের সাথে সেই বাড়ী যাওয়া। তবে নিশ্চয় মাস্কপরা, গ্লোভস পরা ঈদই আমাদের জীবনের শেষ ঈদ নয়।

একদিন আমরা এই পরাক্রমশালী করোনাকে পরাজিত করবো। ঈদের উৎসবী আমেজটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো এবং গলা ছেড়ে, মুক্তির আনন্দে গেয়ে উঠবো….. ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানি তাগিদ……………..

লেখক: উন্নয়নকর্মী ও প্রশিক্ষক

ভয় – এসআই মেহেদী

ভয়ে আজ থরথরিয়ে হাতটি কাঁপছে! কী বোর্ডে হাত ঠিকমতো পড়ছে না। মাথাটাও কেমন যেন দপ দপ করছে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। খুব খুব বেশি ভয় হচ্ছে! অজানা আতঙ্কে হৃদয়ের কম্পন গতি বেড়েই চলেছে। একটি পরাজয়ের ভয় যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে আমার মানসপটে। কেন এতো ভয় হচ্ছে আমার?

৭১ এর রনাঙ্গনে গুলিবিদ্ধ কিশোর ছেলেটিতো সেদিন ভয়ে কাঁদেনি! জীবনের শেষগুলিটিও তো তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি? তের বছরের কিশোরী মেয়েটি সেইদিন দশজন পাকিস্তানী নরপশুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে এতটুকু ভয় পায়নি? সেই একই দিনে, রাজারবাগ বেতারের কনস্টেবল তো আক্রমণের খবর ছড়িয়ে দিতে ভয় পায়নি! এমনকি আমার পূর্ব পুরুষরা সাজোয়া ট্যাংকের উপর গুলি ছুড়তেও একাত্তরে ভয় পায়নি। তাহলে আজ আমি কেন এতো ভয় পাচ্ছি? আমি তো তাদেরই উত্তরসূরী। তাহলে কি আমি ভীতু! সত্যিই কি আমি ভীতু?

আমিও তো চালিয়েছি সিন্দাবাদের সেই পঙ্খীরাজ। দুর্দান্ত দাপটের সাথে টিপু সুলতানের মতো, আস্তাবলের সবচেয়ে তেজি ঘোড়াটা নিয়ে ছুটেছি সারদার পুলিশ ট্রেনিঙয়ের মাঠে। এক লাফে চুড়ায় উঠেছি; নয় ফুট উচ্চতার সমান সীমানা প্রাচীরের। রশি বেয়ে উঠেছি বাইশ ফুট। গ্রীষ্মের কাটফাটা দাবদাহের গরমে পুড়ে কংক্রিটের রাস্তা ধরে প্রতিদিন দৌড়েছি দশ কিলোমিটার পথ।

একআঙ্গুলে বহন করে চলেছি চার কেজি ওজনের হাতিয়ার। আমার আঙ্গুলের ইশারায় গগনবিদারী শব্দে গর্জে উঠেছে বিশ্বসেরা সব আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু আমি তখন একটুও ভয় পাইনি।প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে দেখেছি

নতুন নতুন কবর! যারা কয়দিন আগে আমাদের মতো করে দৌড়াতো এই কংক্রিটের রাস্তা ধরে। দেখেছি সারদাহ এর মাঠে হঠাৎ পাশের বন্ধুটি কংক্রিটের উপর পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে।

আর আমরা তাকে ফেলে দৌড়ে চলেছি। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে কতো জন ভেঙ্গেছে হাত, পা এবং কোমর। তাদেরকে নিয়ে দ্রুত গতিতে মাঠ ছেড়েছে অ্যাম্বুলেন্স। তখনতো কোন ভয় পায়নি আমি। মৃত্যু পুরীতে কাটিয়েছি একটি বছর। প্রতিদিন আশে পাশে ঘুরেছে আজরাইল।

একটুও ভয় পাইনি। কিন্তু আজ আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। এক বছরের মৌলিক প্রশিক্ষন শেষে পবিত্র সংবিধান, পতাকা ও পবিত্র কোরআনে উপর হাত রেখে শপথ করছি দেশ মাতৃকার প্রয়োজনে নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করবো না। তাহলে কেন? কেন সেই আমি আজ ভয় পাবো?

আমার ভয় হচ্ছে। বড্ড ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, হাজারো আশরাফুল শেখদের কথা ভেবে। নড়াইলের আশরাফুল শেখ। বয়স আর কতোই বা হবে!দুই কন্যা সন্তানের জনক তিনি। বড় মেয়েটি এবার অনার্স শেষ করেছে; আর ছোট মেয়েটি এবার এইচ এস সি দিবে।

আশরাফুল শেখ রোগাক্রান্ত জীর্ণ শীর্ণ শরীরে মাদুরের বোঝা মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে। তার পা যেদিন চলে না; বাড়ির চুলাটাও সেইদিন জ্বলেনা। আশরাফুল শেখের শরীরটা বেশ কয়েক বছর ধরেই খারাপ। চিকিৎসা তো দূরের কথা, মৃত্যুর আগ পযর্ন্ত একবেলা বিশ্রাম তার কপালে জোটেনি। তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তিনি। একটি মাত্র কুড়ে ঘর ছাড়া আর কোন সম্পদ তার নাই। মেয়ে দুইটি পড়াশুনায় খুব ভালো।

আশরাফুল শেখ ক্ষুধা পেটে অসুস্থ শরীরে মাদুরের বোঝাটি মাথায় নিয়ে মনের জোরে ধীরপায়ে এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ফেরি করে। ভাবে বড় মেয়েটা চাকরী পেলে তার আর কস্ট থাকবে না। আশরাফ শেখ শেষ কবে দুপুরের খাবার খেয়েছে তার মনে পড়ে না। কখনো একটা বিস্কুট সাথে কয়েক গ্লাস পানি দিয়ে পেটটা ভরেছে।তবে ইদানীং সে মনে করে তার চিকিৎসা করানোটা খুব বেশী দরকার।

কিন্তু ভাত যেখানে স্বপ্ন; চিকিৎসা সেখানে বিলাসিতা ছাড়া আর কি! ছোট মেয়েটার সামনে পরীক্ষা। তার একটা জামা কেনার দরকার। আশরাফ শেখ প্রতিদিন অল্প অল্প করে জমিয়ে তিনশ টাকার মতো করতে পেরেছে।

বড় মেয়েটার এমবিএ ভর্তীর তারিখ দিয়েছে। লাগবে তিনহাজার টাকা। এই সব ভাবতে ভাবতে আশরাফ শেখ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কোন ভাবেই আশরাফ শেখের জ্ঞান ফেরেনা। স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে নড়াইল সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন।

আশরাফ শেখের মেয়েরা স্থানীয়দের কিছু সহায়তা এবং সুদি মহাজনের কাছ থেকে ধার করে চব্বিশ হাজার টাকা নিয়ে গত ১১/৫/২০২০ তারিখে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে হাসপাতালে ভর্তি করায়। টাকার অভাবে তেমন কোন চিকিৎসা সে পায়নি।

এরই মধ্যে আশরাফ শেখের শরীরে করোনা ভাইরাসের লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়। পরীক্ষায় আশরাফ শেখের করোনা পজিটিভ আসে। অভিমানী আশরাফ শেখ ২০ মে ২০২০ তারিখে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আল্লাহ্র কাছে আপন গন্তব্যে পাড়ি জমান।

কিন্তু আশরাফ শেখ মরেও যেন মুক্তি পেলোনা। পেলোনা প্রিয় ভূমি ও প্রিয় মানুষের বিদায়। যেহেতু আশরাফ শেখ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলো, তাই তাকে কবর দেওয়ার জন্য কেউ জমি দেয়নি। কেউ খুড়তে চাইনি তার কবর। আশরাফ শেখের অসহায় মেয়ে আর স্ত্রীর বুকফাটা কান্নায় গলেনি কারোর হৃদয়।

এদিকে হাসপাতাল থেকে লাশ নেওয়ায় জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছে কতৃপক্ষ। কি করবে আশরাফ শেখের মেয়ে আর স্ত্রী? তাদের তো নিজের কোন জমি নাই। আবার লাশ দাফনের মতো কোন পুরুষ মানুষ ও নাই। তারা অঝোর ধারায় কেঁদেই চলেছে হাসপাতালের সামনে।

আল্লাহ মানুষকে কেন এতো কঠিন পরীক্ষায় নেন? মানুষ কেন এতো বেশী অসহায়? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জোরাজুরীতে আশরাফ শেখের মেয়ে তাদের অসহায়ত্বের কথা কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা লাশ পুলিশ কে দিয়ে দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করে।

আশরাফ শেখের মেয়ে একথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা তার বাবাকে চিকিৎসা করাতে পারলো না; মরার পরে নিজেরা দাফন কাজও করতে পারবে না। তার প্রিয় বাবার লাশটাও বাড়িতে নিতে পারবে না।

আশরাফ শেখের মেয়ের বুক ফাটা চিৎকারে হাসপাতালের আশপাশে এলাকার বাতাস ভারি হয়ে উঠে। বারবার বাড়িতে ফোন করে কোন সাড়া না পেয়ে

আশরাফ শেখের মেয়ে কান্না থামিয়ে বলে, আপনারা যেটা ভালো মনে করেন সেটাই করেন।

আমরা লাশ গ্রামে নিতে পারবো না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অফিসার ইনচার্জ মিরপুর মডেল থানা লাশ দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এইসব দেখে শুনে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। ইদানীং খুব তাই ভয় হচ্ছে আমার!

সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশজনের করোনা পজিটিভ মিরপুর থানায়। করোনা উপসর্গ নিয়ে পরীক্ষার অপেক্ষায় আরো দশজন। তাই ভয় হয় মিরপুর থানার আমরা সবাই যখন করোনা পজিটিভ হয়ে যাবো তখন কি ঘটবে? আশরাফ শেখদের লাশ কি তখন রাস্তায় পড়ে থাকবে?

এজন্যই কি তের বছরের কিশোরীটা সেদিন তার শরীরের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের উদ্দাম নাচ নাচতে দিয়েছিল? সে কি জানতো টাকার অভাবে আশরাফ শেখদের চিকিৎসা হবে না? জমি না থাকার কারনে নিজ গ্রামে তার কবর হবে না?

আশরাফ শেখদের কথা শুনে কি কষ্ট পাবেনা সেদিনের সেই কিশোর যোদ্ধাটি। সে যদি জানতো আশরাফ শেখদের জন্য স্বাধীন দেশে এই পরিনতি অপেক্ষা করছে তাহলে কি সে ভয় পেতো না?

সে কি পারতো গুলি করে লক্ষ্য ভেদ করতে? নিশ্চয়ই এ কথা জানলে তার হাত কাপতো! বুক চিতিয়ে দাড়াতে পারতো না সেদিন রাজার বাগের পুলিশ বাহিনী!

তাই আজ আমার বুক ভয়ে দূরু দূরু করছে! আমার তো টাকা নাই; চিকিৎসা হবেতো? আমার জমি নাই কবরের জন্য; কেউ জমি দিবে তো? আমার থানায় বিশজন আক্রান্ত!

আমি যদি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আমার লাশ নিজ গ্রামে নেওয়া হবেতো? তাই একথা বলতে আজ আমার কোন লজ্জা নাই! ভয়ে আমার বুকটা কাঁপছে।

সত্যিই খুব ভয় পাচ্ছি আমি।

মেপ্র/এমএফআর

পুরুষের বোবা কান্না-এস আই মেহেদী

পুরুষের বোবা কান্না প্রেক্ষিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন২০০০(সং২০০৩)

আজ মনটা ভিষন খারাপ। প্রিয় সহকর্মী, এস.আই আব্দুল কাদের ভাই করোনায় আক্রান্ত হয়ে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি।

তাঁর খুব মুরগীর মাংস খেতে মন চেয়েছে। ওসি স্যার বাসা থেকে মুরগির মাংস রান্না করে এনেছেন কাদের ভাইয়ের জন্য। রাত ৮.০৫ মিনিটে বেতার যন্ত্র বুঝে নিয়ে ডিউটি শুরু করবো। বেতার কং আশরাফ ভাই খুবই মিষ্টভাষী একজন মানুষ। সালাম স্যারঃ আপনার কি স্পেশাল ৭১ ডিউটি স্যার?

আমিঃ হ্যাঁ, আশরাফ ভাই। কোন ম্যাসেজ আছে নাকি?
না স্যার তেমন কিছু না, ঐ কাদের স্যারের জন্য ওসি স্যার মুরগির মাংস দিয়েছে। যদি স্যার কস্ট করে একটু পৌছে দিতেন, স্যার। নিশ্চয় নিশ্চয়।

দেন দেন! স্যার, আর একটা ম্যাসেজ আছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আপনার এলাকার কিছু ত্রাণ আছে স্যার, পৌছে দিবেন। আপাতত এইটুকুই স্যার।

ছুটে চললো গাড়ি রাজার বাগের দিকে। অনেকদিন পরে মিরপুরের বাইরে যাচ্ছি। গাড়ি যতই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ততোই যেন চেনা এই শহরটা বড় বেশি অচেনা মনে হচ্ছে। কোথাও কেউ নেই মাঝে মাঝে দুই একটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়ি।

কখনো কখনো অত্যন্ত উদাসী বাইক আরোহী ছুটে চলেছে আপন গন্তব্যে ফাঁকা রাস্তাধরে। হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে মলিন মুখে এক ট্রাফিক কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দিকে তাকাতেই কেন যেন মনে হলো জনশূন্য এই শহরে বেচারা বড় বেশি একাকিত্বে ভুগছেন। আর প্রিয় জনের প্রিয় স্মৃতি গুলো হাতড়াচ্ছেন।

আমি গাড়ির গ্লাসটা আর একটু নামিয়ে ড্রাইভার কিবরিয়া কে বললাম এই

এটা কি বিজয় স্মরনী? জ্বি স্যার!
বিজয় স্মরনিতে আজ আর কোন সিগনাল নাই। নাই গাড়ির লম্বা লাইন। বার বার উচ্চস্বরে কানফাটানো হর্ন বাজিয়ে উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকের সেই দামি দামি গাড়ি থেকে শুনা যাচ্ছেনা ট্রাফিক পুলিশের উদ্দেশ্য দেওয়া সেই তির্যক গালি।

সেই ভদ্রলোক গুলো আজ পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে নিজ গৃহে অবস্থান করছে। কিন্তু আজো একপায়ে ঠাই দাড়িয়ে আছে, পরিবার পরিজন ফেলে বিজয় স্মরণীর মোড়ের সেই ট্রাফিক কনস্টেবল। এই সব ভাবতে ভাবতেই একসময় আমাদের গাড়ি পৌছে গেলো রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের গেটে। গেটে দ্বায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা জানালেন এখন কোন কিছু দেওয়া যাবে না।

তাদের অনেক অনুরোধ করলাম কিন্তু কিই বা তাদের করার আছে? তারাও তো নিয়মের বেড়াজালে বন্দী। ঘটনাটি ওসি স্যারকে মোবাইল ফোনে অবহিত করে আবারো রওনা করলাম থানার দিকে।

ফাঁকা রাস্তাদিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি। হঠাৎ দেখি রাস্তা জ্যাম। গাড়িথেকে নেমে জানতে পারলাম ত্রাণের দাবীতে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করেছে। মনে পড়ে গেলো মুরব্বিদের মুখ থেকে শোনা সেই কথাটি। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান বানতে হয়।

আমাদেরও ধান বানা শুরু হলো। শতাধিক জনতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলাম। ভুলে গেলাম সামাজিক দূরত্ব ও করোনার ভয়। আবারো ছুটে চলেছি থানার দিকে এতোক্ষণ বেতার যন্ত্রটার দিকে খেয়াল ছিলোনা। হঠাৎ দেখি বেতার যন্ত্রটি বেজে চলেছে।
ইকো ৭১! স্পেশাল ৭১! লোকেশন কোথায় স্যার? বললাম, থানার কাছাকাছি। একটা নাম্বার লিখেন স্যার। ৯৯৯ এর কল ব্যবস্থা নেন স্যার। প্রাপ্ত নাম্বার টিতে ফোন করে পরিচয় দিয়ে সমস্যার কথা জানতে চাইলাম। অপর প্রান্তথেকে এক ভদ্রমহিলা অত্যন্ত কর্কস কন্ঠে জানতে চাইলো আমি কোথায়?

আমি আমার অবস্থান জানিয়ে তার সম্যার কথা জানতে চাই। তিনি বললেন, তার স্বামী তার বাচ্চাদের মারধোর করছে। আমি ভদ্র মহিলাকে বললাম, আপনার বাচ্চা মানে কি, বাচ্চা কি আপনার স্বামীর না? বাবাতো বাচ্চাদের একটু শাসন করতেই পারে।

এখানে আমাদের কি করার আছে। তার পরে তিনি যেটা বললেন, তার স্বামী বাসার কোন খরচ দেই না। এইসব বিষয় নিয়ে আজ আমাকে ও আমার

বাচ্চাদেরকে মারধর করেছেন। আমি ভদ্র মহিলাকে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেওয়ায় উনি খুব রেগে গেলেন। উনি আমাকে শুনাইতে ভুললেন না যে, উনার অনেক বড় বড় পুলিশ অফিসার আছেন।

ভদ্র মহিলার কথা শুনে আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো আমি উনার স্বামীর মোবাইল নম্বর নিয়ে ফোন করে পরিচয় দিয়ে তার স্ত্রীর দেওয়া অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলাম।

ভদ্রলোক পেশায় একজন ডাক্তার। তার বাবাও একজন ডাক্তার ছিলেন। ভদ্রলোক বর্তমানে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চাকুরী করে। গত চারমাস তিনি বেতন পাননি। তারপরেও গত মাসে ৮৫,০০০/= হাজার টাকা স্ত্রীকে দিয়েছেন।

ভদ্রলোক অনবরত কেঁদে যাচ্ছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে জানালেন যে তিনি ১৯৯৫ সালে বিয়ে করেছেন। তাদের মেয়েটি এবার এইচ এস সি দিবে, আর ছেলেটি ক্লাস ফোরে পড়ে। বিয়ের পর থেকে তার স্ত্রী কখনোই বাবা মার সাথে থাকেন নি। তিনি যে গালি গুলো আমাকে শুনালেন তা অত্যন্ত অশ্রাব্য অশালীন যা লিখা সম্ভব না। তিনি আরো যেটা বললেন তাকে দুই দুই বার মেরে রক্তাক্ত করেছেন। তিনি লোক লজ্জার ভয়ে থানা পুলিশ করেন নি।

তার সাথে আমার আট মিনিট পয়তাল্লিশ সেকেন্ডের কথার মধ্যে পুরোটা সময় জুড়ে কেঁদেছেন আর বার বার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পারিনি আমি তদন্ত করে তার কোন উপকার করতে। দিয়েছি শুধুই শান্তনা। পারিনি এরকম হাজারো পুরুষের কান্নার কোন জবাব দিতে। তাইতো বলি আইন হবে মানবের কল্যানে কেন তা হবে নির্যাতনের হাতিয়ার?

মেপ্র/এমএফআর

প্রতিটা দিনই হোক মা দিবস…..

আমার কাছে মায়ের জন্য বিশেষ কোন দিন নেই। প্রতিদিনই মা ময়। শুধু আমার না, আমাদের পাঁচ ভাইবোনের কাছে প্রতিদিনই মা দিবস।

আমি তখন কোন ক্লাসে পড়ি মনে নেই। খুব বৃষ্টি পড়ছিলো। সেই ঝুম বৃষ্টির সাথে চোখের পানি মিলিয়ে আমি মায়ের কাছে হাজির। হাতে গোসল করানো বই খাতা। মা আমাকে একঝলক দেখলো তারপরেই নিজেকে মায়ের বুকের মধ্যে দেখলাম আমি। আমাকে সেদিন আমাদের শহরের বিরাট বড় মস্তানের ভাগ্নে রাস্তার পাশের ডোবাতে ফেলে দিয়েছিলো। শোনার সাথে সাথে আমার মা হাতে একটা লাঠি নিয়ে সেই ভাগ্নের সামনে হাজির। দু তিন ঘা দেবার পর ভাগ্নে আরো উত্তেজিত হয়ে থাকে তার মস্তান মামার ভয় দেখাতে থাকে। আহা!! হঠাৎ আমি আবিস্কার করলাম যে ভয় দেখানোর কান আমার মায়ের হাতে আর মুগ্ধ দর্শক হয়ে মায়ের পিছনে। আমরা হাজির সেই মস্তানের বাড়িতে। সেদিন নতমুখে সেই মস্তানকে মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে দেখেছি। আজো চোখ বন্ধ করলে আমার অসীম সাহসী মা আমাকে সাহস দেয়।
আমাদের বাসায় টিভি ছিলোনা। আমরা পাশের কোন এক বাসায় মাঝে মাঝে হানা দিতাম টিভি দেখার জন্য। কার্টুন ছিলো রানার খুব প্রিয়। রানা আমার ছোট ভাই। একদিন কার্টুন দেখার সময় বাসার মালকিন আমাদের মুখের উপর টিভি বন্ধ করে দিলেন। আমাদের মন খুব খারাপ। রানার মন খারাপ একটু বেশি। মালকিন টিভি বন্ধ করার পর আমাদের বলে ছিলেন নিজের বাসায় টিভি দেখতে। আমাদের টিভি নেই কেন এই কষ্টে রানার মন বেশি খারাপ ছিলো। মা শুধু আমাদের সবাইকে বুকের মধ্যে নিয়েছিলেন বলেননি কিছুই। পরদিন সকালে মা নেই। মা আসলো দুপুরের পর। বিরাট বড় একটা বাক্স নিয়ে। সেই বাক্সটা ছিলো আমাদের জন্য জাদুর বাক্স। বাসায় প্রথম ১৭ ইঞ্চি তানিন টিভির আগমন। আমরা ভাই-বোনেরা কোন কোনদিন দিনের বেলায় টিভি চালিয়ে বসে থাকতাম আর মাছি উড়া দেখতাম। আর মা লাগাতার আমাদের মন খারাপের সময়কে সুখের বানিয়ে দিতেন।
আমার বাবা বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলেজ শিক্ষক বাবার জীবনে যতোবার সংকট এসেছে আমার মা সেই সংকটে ঢাল হয়ে দাঁড়াতেন। সংকটের মধ্যে মধ্যে দিন কাটানো আমরা কতদিন দেখেছি ম সাহস দিচ্ছেন আব্বুকে। আর আমার বাবা সেই সাহসে সংকট জয় করছেন। তখন থেকেই মা আমাদের কাছে মুশকিলআসান।
আমার বন্ধুর মতোন মা অকালে প্রয়াত প্রেমিকার চিঠি, কার্ড যত্ন করে গুছিয়ে রাখতেন বাবার ড্রয়ারে যেটা আমার জন্য বরাদ্দ ছিলো। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি তিনি একজনকে সাহস দিচ্ছেন, অভয় দিচ্ছেন সে যেন ভয় না পাই আর ভুল না করে সেই জন্য। আবার জীবিত প্রেমিকাকে ঘরে এনে ছেড়েছেন আমার থেকেও বেশি প্রেম দেখিয়ে।
কাজের কারনে প্রায় সারা দেশেই ঘুরতে হয় আমার। বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষের সাথে আমার মেশামিশি। কাউকে কাউকে আমি মা ডাকি আম্মা

ডাকি। এই ডাকাডাকির স্বভাব আমার বেশ পুরাতন। একবার একজন আমার মায়ের কাছে নালিশ করলেন। বিষয় হলো আমার মা কেন এইসব সহ্য করে, কেন আমাকে কিছু বলেনা। কাকতালীয় ভাবে আমি সেদিন আমাদের ড্রয়িং রুমে আর মা তাঁর ঘরে। আমি বোধহয় একটু দ্বিধা জনিত উৎকন্ঠায়। আমি সেদিন যে উত্তর মায়ের মুখে শুনেছিলাম তা আজো কানে তোলা আছে, মনে গেঁথে আছে। মা সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলেন, আমার ছেলে যদি কাউকে মা ডাকে আর তাঁর আদর যদি নিতে পারে তবে তো সেটা গর্ব। আপনি একবার ভাবেন আমার ছেলেটা কতজনের ছেলে হয়ে উঠছে। আবার দেখেন অন্যকে মা ডাকার কারনে আমার প্রতি তার ভালোবাস কমেনি বরং বেড়েছে অনেকগুন। আমি জানি -আমি একদিকে আর আমার ছেলের কাছে বাকি দুনিয়া একদিকে। তাই এটা নিয়ে আমার কোন আফসোস নেই বরং গর্ব আছে।………. মায়ের দেয়া এই উত্তরটা আমাকে সকল মায়ের সন্তান বানিয়েছে।
মায়ের কারনেই আজ এই করনাকালে আমরা অন্য মায়েদের পাশে দাঁড়াচ্ছি। এমন বন্ধু, মুশকিলআসান মায়ের জন্য কি শুধু একটা দিন চলে। তাই আমাদের কাছে মায়ের জন্য নির্ধারিত দিন নেই। আমাদের সকল দিনই মা দিবস। কোন মায়ের জন্য একটা দিন নির্ধারন করে দেওয়া তাঁকে কেমন যেন দুরের মানুষ বানিয়ে দেয়। সকল দিনই আপনার জন্য মায়ের মমতায় ভরে উঠুক। যারা মাকে হারিয়েছেন তারা সকল জীবিত মায়ের মধ্যে নিজের মাকে খুঁজে পাক। সকল মায়ের জন্য ভালোবাসা। আমাদের মায়েরা দীর্ঘজীবি হোক। অনেক ভালোবাসা মায়েদের জন্য…..

লেখক : উন্নয়ন কর্মী